



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 628 - 634

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

অজয় ভট্টাচার্যের গান

ড. পার্থসারথি সরকার

সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান

কোটশিলা মহাবিদ্যালয়, পুরুলিয়া

Email ID : parthasarathisarkar20111102@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

আধুনিক গান,
চলচ্চিত্রের গান,
কালিদাস, পদাবলী,
রবীন্দ্রনাথ, সাম্যবাদ।

Abstract

পঞ্চ কবির বাংলা গান বাঙালির পরম পাওয়া। তৎ পরবর্তীতে যেসমস্ত গীতিকার বাংলা গানের জগতে উল্লেখযোগ্য নাম হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অজয় ভট্টাচার্য অন্যতম। কুমিল্লার কৃতি মানুষটি ছাত্রাবস্থা থেকেই সাহিত্য রচনায় দক্ষ ছিলেন। নজরুলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ‘ধুমকেতু’ পত্রিকায় তাঁর পথ চলা শুরু হলেও পরবর্তীতে বাস্তববাদ এবং সাম্যবাদ তাঁকে প্রেরণা দেয়। অনুবাদে তিনি দক্ষ ছিলেন। অসংখ্য বিদেশী সাহিত্যের সাবলীল অনুবাদ করেছেন তিনি। বাংলা চলচ্চিত্রের জন্য কাহিনী রচনা করেছেন সারথকতার সঙ্গে, তথাপি তাঁর প্রতিভার সার্বিক প্রকাশ করেছে গানে। অজয় ভট্টাচার্য আধুনিক গান, ভক্তিগীতি, কাব্যগীতের পাশাপাশি পল্লী সংগীত, বাউল, ভাটিয়ালি গান রচনা করেছিলেন। চলচ্চিত্র রবীন্দ্র সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে বহু ক্ষেত্রে তাঁর গান ব্যবহৃত হয়েছে অবলীলায়। গান রচনায় সংস্কৃত সাহিত্য বিশেষতঃ কালিদাস দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছেন। মহাজনের পদাবলী থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন বারবার। তাঁর কাব্যকৃতি নিয়ে যথাযথ আলোচনা করেছিলেন দিলীপ কুমার রায়। পারস্য কবির সঙ্গে তিনি অজয় ভট্টাচার্যের মিল দেখেছিলেন অনেক। অজয় ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি। বহুক্ষেত্রে শুধুমাত্র শব্দ ব্যবহারই নয়, রবীন্দ্র শব্দবন্ধ ব্যবহারেও তিনি বারবার করেছেন। রবীন্দ্র কবিতার সার তাঁর গানে আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিকশিত হয়েছে। রবীন্দ্র কবিতার ঝঙ্কার তাঁর গানে ফিরে ফিরে এসেছে। বঙ্কু পঞ্চজকুমার মল্লিকের অনুরোধে তিনি রবীন্দ্র অনুকরণে দুখানি গান লেখেন — যা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। রবীন্দ্র দার্শনিকতা অজয় ভট্টাচার্যকে প্রভাবিত করেছে। সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বোত্তম কবি কালিদাস তাঁর কাব্যে এসেছে বেশ কয়েকবার। মেঘদূতের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি গান রচনা করেছেন। পদাবলিও তাঁকে প্রভাবিত করেছে। ধ্রুপদী সাহিত্যের পাশাপাশি লোক সংগীত তাঁকে প্রভাবিত করেছে। ভাটিয়ালি গান তিনি রচনা করেছেন, রচনা করেছেন বাউল গানও। কমিউনিস্ট ভাবধারার প্রতিকার সমর্থন থাকার জন্য তাঁর বেশ কিছু গানে সে প্রভাব লক্ষ্য করা যায় যায়। তাঁর গানের ভাষা অত্যন্ত সহজ সরল—

বাহ্যাবলম্বিত। শব্দ ব্যবহারের পাশাপাশি ছন্দ এবং অলংকারের ব্যবহার অত্যন্ত স্বাভাবিক সাবলীল। গান রচনা করলেও অজয় ভট্টাচার্য মূলত কবি। গানের কাঠামোতে এই বিষয়টি লক্ষণীয়। অজয় ভট্টাচার্য তাঁর স্বল্প জীবনে দেড় হাজারের বেশি গান রচনা করেছেন। সংখ্যা এবং গুণগত মান রক্ষা করে তা বঙ্গ সাহিত্যে যে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

Discussion

বাংলা গানের নতুন পথের দিশারী হয়ে এসেছিলেন পঞ্চকবি। এঁদের পরবর্তীতে যে সমস্ত শিল্পী বাংলা গানের অঙ্গনে পদার্পন করেছিলেন তাঁরা পূর্বজন্মের সার্থক উত্তরসূরীর মর্যাদা রেখেছিলেন এবং বাংলা সংগীতকে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। এই সকল গীতিকারদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অজয় ভট্টাচার্য। সমসাময়িক শৈলেন রায়, হীরেন বসু, প্রণব রায়, সুবোধ পুরকায়স্থ-দের পাশাপাশি বাংলা সংগীতের জগতে তিনি আপন স্বাভাবিক বজায় রেখে গীত রচনা করেছিলেন— যা উৎকর্ষের দিক থেকে কোন অংশে হীন ছিল না এবং সংখ্যাগত দিক থেকেও ছিল একজন শিল্পীর রচনার পক্ষে যথেষ্ট দৃশ্যনীয়।

অজয় ভট্টাচার্যের জন্ম হয় অধুনা কুমিল্লা জেলায় ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ৬ জুলাই, যদিও তাঁর জন্মস্থান শ্যামাগ্রাম পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অজয় ভট্টাচার্যের পিতা ছিলেন রাজকুমার ভট্টাচার্য এবং মাতা ছিলেন শশিমুখী দেবী। পিতা রাজকুমার ভট্টাচার্য পেশায় ছিলেন ব্যবহারজীবী। পিতা কুমিল্লা কোর্টে উকিল হিসাবে কাজ করতেন, এবং সে ক্ষেত্রে অর্থ ও সম্মান, দুইই লাভ করেছিলেন। পেশা উকিলের হলেও রাজকুমার ব্যক্তিগত জীবনে নাটক ভীষণ পছন্দ করতেন। এই নাট্যানুরাগের সঙ্গে মিলেছিল তাঁর নাট্যাভিনয়ের দক্ষতা। অজয় ভট্টাচার্যের মা শশিমুখী ছিলেন অত্যন্ত ভাবুক এবং কবি স্বভাবের মানুষ। পিতা-মাতার এই গুণগুলিই সংগঠিত হয়েছিল সন্তানদের মধ্যে। তাঁদের তিন সন্তান — বিজয়, অজয় এবং সঞ্জয়। বিজয় ভট্টাচার্য শিক্ষাক্ষেত্রে মেধাবী ছাত্র হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। মধ্যম কবি-গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য এবং কনিষ্ঠ সঞ্জয় ভট্টাচার্য। সঞ্জয় ভট্টাচার্য স্বনামে উজ্জ্বল — নিজে কবি, পাশাপাশি ‘পূর্বাশা’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রকাশক হিসাবে যথেষ্ট সুনামের অধিকারী ছিলেন।

অজয় ভট্টাচার্যের প্রারম্ভিক শিক্ষাক্ষেত্র ছিল কুমিল্লার দানবীর মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রতিষ্ঠিত পাঠশালা। পড়াশুনোতে তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। পড়াশুনো ছাড়াও কবিতা, গান, নাটক, নাট্যাভিনয়, খেলাধুলা— সবক্ষেত্রেই তাঁর অনায়াস গতিয়াত ছিল। এখান থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বঙ্গবাসী কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলাতে প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থানাধিকার করেন। চিত্র পরিবেশক পশুপতি চট্টোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সহপাঠী ছিলেন। আবাল্য তিনি পেয়েছিলেন গৃহের এবং বাইরের যথাযথ পরিবেশ। কুমিল্লার উন্নত সাংস্কৃতিক ও সাংগীতিক পরিবেশ তাঁর চিত্তে চিরদিন জাগরুক ছিল— যা প্রনোদিত করেছিল তাঁর শিল্প সত্তাকে। তিনি রেণুকা দেবীকে বিবাহ করেছিলেন। অঞ্জন ও শ্রীলা তাঁর সন্তানদের নাম। তিনি শিক্ষাকতা করেছিলেন বালিগঞ্জের তীর্থপতি ইন্সটিটিউশন ও ভিক্টোরিয় কলেজে। অজয় ভট্টাচার্যের প্রথম লেখাটি প্রকাশ পায় নজরুলের ‘ধুমকেতু’ পত্রিকায়। কবিতাটির নাম ছিল ‘উল্কা’। এই কবিতা অনেকাংশে নজরুল দ্বারা প্রভাবিত ছিল। নজরুলের অপরায়ে পৌরুষ এবং অপরিমেয় প্রানোচ্ছাস তাঁকে উদ্দীপ্ত করেছিল সন্দেহ নেই; যদিও পরবর্তীতে শুধুমাত্র নজরুল ভাবনা থেকে সরে আসেন। অজয় ভট্টাচার্য ভ্রাতা সঞ্জয়ের সম্পাদিত ‘পূর্বাশা’ পত্রিকায় পরবর্তীতে অসংখ্য কবিতা ও গদ্য রচনা করেছিলেন।

অজয় ভট্টাচার্যের লেখা কাব্যগ্রন্থগুলি হল— ‘রাতের রূপকথা’, ‘ঈগল ও অন্যান্য কবিতা’, ‘সৈনিক ও অন্যান্য কবিতা’ ও ‘তমসা’। ‘রাতের রূপকথা’ কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে রোমান্টিক অজয় ভট্টাচার্যকে পাওয়া যায়, কিন্তু পরবর্তীতে লেখা ‘ঈগল ও অন্যান্য কবিতা’, ‘সৈনিক ও অন্যান্য কবিতা’, ‘তমসা’ কাব্যগ্রন্থের মধ্যে কবির ঘোর বাস্তববাদী এবং সাম্যবাদী অজয় ভট্টাচার্যকে পাওয়া যায়—

“দেখিতে পাও কি আকাশে উড়িছে অশ্বখুরের ধূলি,
বল্লাবিহীন আগুনে জ্বলিছে কত পৃথিবীর খুলি
পাথরে পাষাণে কালো ইস্পাতে মানুষের পরিচয়
আজিকার রাত হলদে চাঁদের আর কুসুমের নয়।”

তাঁর লেখা উপন্যাস হল— ‘যেথা নাই প্রেম’। এছাড়াও অনুবাদ কর্মের মধ্যে তিনি নিজের শিল্পপ্রতিভার পরিচয় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি অনুবাদ করেছেন এরিখ মারিয়া রেমার্কের ‘রোডব্যাক’, অমর খৈয়ামাএ ‘রুবাইয়েত’ এবং হাফিজের কবিতা। জীবনে অসংখ্য চলচ্চিত্র ও নন ফিল্মি গান রচনা করেছেন, যেগুলোর অনেকখানি সংরক্ষিত হয়েছে ‘আজি আমারি কথা’, ‘মিলন বিরহ গীত’, ‘শুক ও শারী’, ‘আজো ওঠে চাঁদ’, ‘সুরের লিখন’, ‘অজয় গীত সংগ্রহ’, ‘অজয় ভট্টাচার্যার গান’ ইত্যাদি গীতিগ্রন্থের মধ্যে। এগুলির মধ্যে ‘সুরের লিখন’ স্বরলিপি। ‘আজো ওঠে চাঁদ’ গ্রন্থটি অজয় ভট্টাচার্যের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হয়। অজয় ভট্টাচার্যের পরিচালিত চলচ্চিত্র হল ‘অশোক’ এবং ‘ছদ্মবেশী’। তিনি ‘অধিকার’, ‘শাপমুক্তি’, ‘নিমাই সন্যাস’, ‘মহাকবি কালিদাস’ প্রভৃতি চলচ্চিত্রে সংলাপ রচনা করেন। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি ‘অধিকার’, ‘নিমাই সন্যাস’, ‘মহাকবি কালিদাস’ প্রভৃতি চলচ্চিত্রে সংলাপ রচনা করেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে অজয় ভট্টাচার্য যে জন্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, তা মূলত তাঁর গান। সমগ্র জীবনে তিনি চলচ্চিত্র ও বেসিক যে গানগুলি রচনা করেছিলেন তাদের মোট সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। তাঁর গানের মধ্যে ‘আধুনিক গান’, ‘ভক্তগীতি’, ‘কাব্যগীতি’ ইত্যাদি সবরকম গানই রয়েছে। পাশাপাশি বেশ কিছু পল্লিসংগীত, বাউল, ভাটিয়ালীও রচনা করেছিলেন। তাঁর লেখা প্রথম গান ছিল ‘হামুহানা আজ নিরালায় ফুটিল কেন আপন মনে’— যা সাধনা দেবীর কণ্ঠে মুদ্রিত হয়। যদিও তাঁর লেখা গানের প্রথম প্রকাশিত রেকর্ডটি জ্ঞান দত্তের কণ্ঠে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে। রেকর্ডের একপিঠে ছিল ‘মজনু আমার দাও গো বিদায়’ এবং অন্য পিঠের গান ছিল ‘ও পিয়ারী লাইলী আমার’ অজয় ভট্টাচার্যের নন ফিল্মি গানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— ‘আজি নবপরিচয়ে তোমারে চিনি’, ‘আজি আমারি কথা’, ‘আলোক আঁধার যেথা করে খেলা’, ‘কথা দাও দাও সাড়া’, ‘তুমি যে আঁধার’, ‘তুমি যে গিয়াছ বকুল বিছানো পথে’, ‘প্রভু অনল দহন যেথা’, ‘বরষার মেঘ নামে’, ‘স্মরণ পথে কে তুমি আজি’, ‘সাঁঝের তারা গো’ ইত্যাদি। অজয় ভট্টাচার্য যে সব চলচ্চিত্রগুলির জন্য গান রচনা করেছিলেন সেই তালিকাটি হল-

ক্রমিক নং	চলচ্চিত্র	সাল (খ্রিস্টাব্দ)	গীতিকার
	বিদ্রোহী	১৯৩৫	অজয় ভট্টাচার্য
	ব্যথার দান	১৯৩৬	অজয় ভট্টাচার্য
	দ্বীপান্তর	১৯৩৬	অজয় ভট্টাচার্য
	গৃহদাহ	১৯৩৬	অজয় ভট্টাচার্য
	কালপরিণয়	১৯৩৬	অজয় ভট্টাচার্য, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
	মায়া	১৯৩৬	অজয় ভট্টাচার্য
	দিদি	১৯৩৭	অজয় ভট্টাচার্য
	মুক্তি	১৯৩৭	অজয় ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সজনীকান্ত দাস
	মুক্তিমান	১৯৩৭	অজয় ভট্টাচার্য
	রাজাগী	১৯৩৭	অজয় ভট্টাচার্য
	অভিজ্ঞান	১৯৩৮	অজয় ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	দেশের মাটি	১৯৩৮	অজয় ভট্টাচার্য
	সাথী	১৯৩৮	অজয় ভট্টাচার্য

	অধিকার	১৯৩৯	অজয় ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	বড়দিদি	১৯৩৯	অজয় ভট্টাচার্য, জীবনময় রায়, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজ চণ্ডিদাস
	জীবন মরণ	১৯৩৯	অজয় ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ, চণ্ডিদাস
	পথিক	১৯৩৯	অজয় ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ ঘোষ
	রজত জয়ন্তী	১৯৩৯	অজয় ভট্টাচার্য
	সাপুড়ে	১৯৩৯	অজয় ভট্টাচার্য
	অভিনেত্রী	১৯৪০	অজয় ভট্টাচার্য
	আলোছায়া	১৯৪০	অজয় ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	ডাক্তার	১৯৪০	অজয় ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	পরাজয়	১৯৪০	অজয় ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	রাজকুমারের নির্বাসন	১৯৪০	অজয় ভট্টাচার্য, মোহন রায়
	শাপমুক্তি	১৯৪০	অজয় ভট্টাচার্য
	এপার ওপার	১৯৪১	অজয় ভট্টাচার্য, পান্নালাল শ্রীবাস্তব
	মায়ের প্রাণ	১৯৪১	অজয় ভট্টাচার্য
	নর্তকী	১৯৪১	অজয় ভট্টাচার্য, চণ্ডিদাস
	নিমাই সন্ন্যাস	১৯৪১	অজয় ভট্টাচার্য
	রাজনর্তকী	১৯৪১	অজয় ভট্টাচার্য
	উত্তরায়ণ	১৯৪১	অজয় ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হাসিরাসি দেবী
	অপরাধ	১৯৪২	অজয় ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	অশোক	১৯৪২	অজয় ভট্টাচার্য
	মিলন	১৯৪২	অজয় ভট্টাচার্য, প্রেমেন্দ্র মিত্র
	পরিণীতা	১৯৪২	অজয় ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	পাষণ দেবতা	১৯৪২	অজয় ভট্টাচার্য
	ছদ্মবেশী	১৯৪৪	অজয় ভট্টাচার্য, পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়
	দোটানা	১৯৪৫	অজয় ভট্টাচার্য, প্রণব রায়
	প্রতিমা	১৯৪৬	অজয় ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মোহিনী চৌধুরী, সমরেশ চৌধুরী
	পরভূতিকা	১৯৪৭	অজয় ভট্টাচার্য
	শ্যামলের স্বপ্ন	১৯৪৮	অজয় ভট্টাচার্য
	উমার প্রেম	১৯৪৮	অজয় ভট্টাচার্য
	ছায়াপথ	১৯৫৭	অজয় ভট্টাচার্য, বটকৃষ্ণ দে, চারু মুখোপাধ্যায়

চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত বিখ্যাত এবং বহুশ্রুত গানগুলি হল— ‘এই পেয়েছি অনল জ্বালা’, ‘পাখী আজ কোন কথা কয়’, ‘এ গান তোমার শেষ করে দাও’, ‘প্রেম নহে মোর মৃদু ফুলহার’, ‘প্রেমের পূজায় এই ত লভিনু’, ‘বাঁধিনু মিছে ঘর’, ‘রাজার কুমার পক্ষীরাজে’, ‘শুনি ডাকে মোরে ডাকে’ ইত্যাদি— এর অধিকাংশই কে এল সাইগলের গলায় অন্য মাত্রা পেয়েছিল।

গান রচনার ক্ষেত্রে মহাজনের পদাবলী থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ সবাই তাঁকে প্রভাবিত করেছে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কুমিল্লার মহম্মদ খুরসেদ হুসেনের বিশেষ অবদান ছিল; তাঁর গজলের বাণী অজয় ভট্টাচার্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত

করেছিল। ‘ছদ্মবেশী’ মুক্তির বাইশ দিন আগে তিনি আকস্মাৎ পরলোকগমন করেন। অজয় ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পর পরিতোষ শীলের সুরারোপে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ‘হায় বাতায়নে কুসুম দোলে’ গানটি।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সুযোগ্য পুত্র দিলীপকুমার রায় তাঁর ‘সাংগীতিকা’ বইয়ে অজয় ভট্টাচার্যের গানের বাণী নিয়ে আলোচনা করেছেন। তুলনামূলক আলোচনার মধ্যে তিনি অজয় ভট্টাচার্যের লেখা বাউল গান ‘মহাভাবের মানুষ রে যে জনা তারে দেখলে যায় রে চেনা’-র সঙ্গে রুমির লেখা ‘কথায় কথায় আর কতকাল থাকবি ভুলে’র সাযুজ্য দেখিয়েছেন। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের ‘তুমি মোরে পাও নাই পরিচয়’-এর সঙ্গে ‘আমি আজ নিয়ে যাই পরাজয়’ এবং ‘যাও যাও যদি যাও তবে’-র সঙ্গে ‘নাও নাও মালা গলে’-র সাযুজ্য দেখিয়েছেন।

বাংলা গানের প্রথম কয়েক দশক যাঁদের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে তো পারেইনি বরং সে চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করেছিল তাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রধান। নজরুলের কথাও সেখানে বারবার উঠে আসে। উনিশ শাহিত্যের গীতিকবিতার যে পেলবতা বঙ্গসাহিত্যে অঙ্গীকৃত হয়েছিল, যা পঞ্চকবির গানে বর্ণিত হয়েছিল, তাই অনুসৃত হয়েছিল বিশ শতকের প্রথম কয়েক দশকের বাংলা গানে। অজয় ভট্টাচার্যও নিজ সঙ্গীতে সেই ভাষা প্রয়োগে সক্ষমতা দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের হাতে এই ভাষা বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। ব্যবহারের নৈপুণ্যে তা যথার্থ রাবিন্দ্রীক হয়ে উঠেছিল। এই শব্দ ও শব্দবন্ধের ব্যবহার অজয়গীতের মাধুর্য দান করেছে। যেমন— ‘বিমনা সাঁঝ’, ‘স্মরণ বীণ’, ‘আঙিনা তল’, ‘স্মরিয়া’, ‘মৃদু ফুলবাস’, ‘সমীর নিশ্বাস’, ‘দিঠি’, ‘আন কাজ’, ‘মাগিয়া’, ‘উন্মনা’, ‘অশ্রু শিশির’, ‘অশ্রু শিশির’, ‘মৌন ব্যথা’, ‘পলে’, ‘সুবাস’, ‘করেছিনু’, ‘ফুলডোর’, ‘রহিও’, ‘হিয়া’, ‘বলতল’, ‘মালিকা’, ‘ঝাঁপি’, ‘অবসান’, ‘কুলায়’, ‘কলতান’, ‘জীবন-নাথ’, ‘সরম রাজা’। এছাড়াও কোন কোন শব্দবন্ধের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সরাসরি যোগ লক্ষ্য করার মতো। রবীন্দ্রনাথের ‘রক্তকরবী’র ‘ঘুমভাঙানিয়া’কে অজয় গ্রহণ করেছেন— “ঘুমভাঙানিয়া গীতি রাতের পাখায় বাজে”। রবীন্দ্রনাথের ‘অভিসার’ কবিতাটি ‘মমমন্দিরে’ গানটির মধ্যে নিজ রূপ ব্যক্ত করেছে। আবার অজয়ের ‘প্রেম নহে মোর মৃদু ফুলহার’ গানটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বারবার ধ্বনিত হয়েছে। ‘ফুলের দিন’-গানের ‘শেষের খেয়া ফিরিল হায়’ রবীন্দ্র দার্শনিকতার দিকটিকেই প্রকাশিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের ‘আজি মর্মর ধ্বনি কেন জাগিল রে’- গানটির প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় তাঁর ‘তমালের হিয়াতল রাঙিল’ গানে। অন্ত্যমিল সজ্জ্বিত হয়েছে যথাক্রমে ‘লাগিল রে’, ‘জাগিল রে’ ও ‘মাগিল রে’-র মধ্যে দিয়ে।^২ আবার রবীন্দ্রনাথের ‘এসো নীপবনে ছায়াবীথি তলে’- গানটির কথাকে অজয় ভট্টাচার্য তাঁর গানে অঙ্গীকৃত করে লেখেন ‘আজি নীপ-বন তলে/ নব মেঘছায়া আসে’ গানটি।^৩ অজয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে পঙ্কজকুমার মল্লিকের ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। পঙ্কজকুমার রবীন্দ্রনাথের গান ‘তুমি মোর পাও নাই পরিচয়’ এবং ‘যাও যাও যাও তবে’ রেকর্ড করেন, কিন্তু বিশ্বভারতীর অনুমোদন না মেলায় জন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হন। সেকথা তিনি বন্ধু অজয় ভট্টাচার্যের কাছে ব্যক্ত করেন। অজয় ভট্টাচার্য বিষয়টি মন দিয়ে শোনে এবং দুটি গান লেখেন উক্ত দুটি গানকে সামনে রেখেই। ‘তুমি মোরে দাও নাই পরিচয়’-কে অনুসরণ করে ‘আমি আজ নিয়ে যাই পরিচয়’ এবং ‘যাও যাও যদি যাও তবে’ গানটিকে সামনে রেখে রচনা করেন ‘নাও মালা নাও গলে’ গানটি। গানদুটি সাধারণ শ্রোতার কাছে রবীন্দ্রসংগীত বলে মনে হতে পারে। গানদুটি জনপ্রিয়ও হয়েছিল।

ঐতিহ্যের অনুবর্তন অজয় ভট্টাচার্যে অত্যন্ত সহজেই লক্ষ্য করা যায়। সেখানে কালিদাস থেকে বৈষ্ণব মহাজনদের পদ, শাক্ত পদের আগমনী বিজয়ার সুর যেমন খেলেছে তেমনি ধরা পড়েছে ভাটিয়ালী সুর, ভজনের স্বকীয়তা। বাঙালি সাহিত্যিক কালিদাসের কাছে ঋণী; বিশেষত কালিদাসের ‘মেঘদূতের’ এক অনতিক্রম্য প্রভাব আছে অজয়গীতিতে তারই অনুরণন আছে। কালিদাসের ‘মালবিকা’-র কথা তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যখন ‘আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে’ বঙ্গীকৃত হয় ‘প্রথম আষাঢ় সাঁঝে’ (বরষার মেঘ নামে) কিংবা ‘প্রথম আষাঢ় (হের নীল নভঃ) হিসাবে। ‘তমালের হিয়াতল রাঙিল’, ‘প্রথম আষাঢ় সাঁঝে’, ‘প্রেম যমুনার তীরে’ ইত্যাদি গানগুলির মধ্যে আসে বৈষ্ণবীয় অনুশঙ্গ। ‘সাজে নওল কিশোর’ গানটির মধ্যে ‘ব্রজভাখা’র অনায়াস প্রয়োগ প্রসংশার দাবী রাখে। ‘বরষার মেঘ নামে ঝরঝর বরিষণে’ গানটির মধ্যে কালিদাস এবং পদাবলী মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। প্রথম কয়েকটি লাইন স্পষ্ট ‘মেঘদূত’কে মনে করায়—

“বরষার মেঘ নামে ঝরঝর বরিষণে

প্রথম আষাঢ় সাঁঝে চামেলী সে জাগে বনে।

হেরিয়া এমন মেঘ কে গো একা ছিল জেগে
জ্বলেছিল ম্লান দীপ কার গৃহ বাতায়নে?”^৪

আর এর পর বৈষ্ণবীয় অনুষ্ণ, রাধিকার অভিসার—

“নূপুর খুলিয়া ফেলে কে গো অভিসারে গেলে
সে কোন অতীত লয়ে কার আঁখিজল ব’য়ে
আজি এ বাদলরাতি কেঁদে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।”^৫

‘স্বপন দেখিছে গিরিরানী’ গানটি আগমনী গান হিসাবে সার্থক আবার ‘বিদায় দাও গো মোরে’ গানটিতে উমার কথা— যা বিজয়ার বেদনায় বিধুর।

অজয় ভট্টাচার্যের লেখা বেশ কয়েকটি ভাটিয়ালী গানের সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে ‘কে যাবি বল বৃন্দাবনে’ একটি তবে কিছু গানে যে ভাটিয়ালীর রস ফুটে উঠেছে তা সত্যি অকৃত্রিম—

“ওরে সুজন নাইয়া
কোন্ বা কন্যার দেশে যাও রে
চান্দের ডিঙ্গি বাইয়া”^৬

অজয় ভট্টাচার্যের মধ্যে যে কমিউনিস্ট ভাবধারার প্রতি সমর্থন ছিল তার প্রকাশ তাঁর কাব্যগ্রন্থ ও অন্যান্য লেখনীতে পাওয়া যায়— পাওয়া যায় গানেও। তাঁর লেখা বেশ কিছু গানের হৃদিস পাওয়া যায়, যেগুলির মধ্যে সাধারণ মানুষের কথা অত্যন্ত বাস্তবতার সঙ্গে পরিস্ফুট হয়েছে, এমনি একটি গান হল ‘একটি পয়সা দাও গো বাবু’। ‘দুঃখে যাদের জীবন গড়া’ গানটিও যেন চোখে দেখা বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি—

অজয় ভট্টাচার্য তাঁর গানে অত্যন্ত সাবলীলভাবে ছন্দ ও অলংকারের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে মনে হয়। অনুপ্রাসের প্রয়োগে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন —

“জাগার সাথী গো মম... মুঞ্জরে গুঞ্জরে।”^৭

অজয় ভট্টাচার্য আদপে কবি। গানের ক্ষেত্রে অনেক সময় শব্দের ঘাটতি সুরের মধ্যে দিয়ে পূরণ হয়ে যায় কিন্তু অজয় ভট্টাচার্যের গানে তেমনটা খুব কমই পরিস্ফুট হয়। তাঁর কবিতা গাঠনিক দিক থেকে প্রায় ত্রুটিশূন্য। ‘স্বপন না ভাগে যদি’, ‘ফাগুন এলো বুঝি’ গানগুলির মধ্যে a a b b a গঠনভঙ্গি রক্ষিত হয়েছে। ‘মধু রাতে যদি’-তে a a b b a, c c a - গঠনভঙ্গি এসেছে। ‘ফাগুন এলো বুঝি’র মতো কিছু গানকে বিশ্লেষণ করলে তার সুন্দর গাঠনিক রূপটি লক্ষ্যনীয়—

“ফাগুন এলো বুঝি মছয়া মালা গলে,
চরণ রেখা তারি পিয়াল তার তলে।
পরাগ রাঙা চেলী
অশোক দিল মেলি
শুকাল ব্যথা বারি মুকুল আঁখি-কোলে।

ধেয়ানে হিমঝতু জপেছে যারে নিতি,
আজিকে বনপুরে বাজিল তারি গীতি।
লইয়া ফুল ডালি
বিরহ শিখা জ্বালি

না জানি কোন্ দূরে কোথা সে যাবে চলে।”^৮

অজয় ভট্টাচার্যের সাহিত্য বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায়, তিনি একদিকে যেমন কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ, ডায়েরি, চিঠিপত্র, চলচ্চিত্রের সংলাপ রচনা করেছেন, তেমনি উপন্যাসও লিখেছেন; তথাপি সমস্ত কিছুকে ছাড়িয়ে গেছে তাঁর গান - সংখ্যায় যা প্রায় দেড় হাজারের অধিক। মাত্র সাঁইত্রিশ বছরের জীবনকালে তিনি যে ঐশ্বর্য বঙ্গসাহিত্যে রেখে গেছেন তা যে কোন শিল্পীর কাছে সাধনার বিষয় তাতে কোন সন্দেহ নেই।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, অজয়, সৈনিক ও অন্যান্য কবিতা, পূর্বাশা প্রেস, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ২১
২. ভট্টাচার্য, রেণুকা (সম্পাদনা), অজয় ভট্টাচার্যের গান, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি, কলকাতা ৭০০০৩৩, পৃ. ১১৪
৩. ভট্টাচার্য, অজয়, অজয়-গীত সংগ্রহ, এম সি সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৩৮২, পৃ. ২৫
৪. ভট্টাচার্য, রেণুকা (সম্পাদনা), অজয় ভট্টাচার্যের গান, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি, কলকাতা ৭০০০৩৩, পৃ. ১১৪
৫. তদেব
৬. তদেব, পৃ. ১২
৭. তদেব, পৃ. ১৮
৮. তদেব, পৃ. ২৯